ত্রিপুরাজাতিস্পৃষ্ট জলপান বিষয়ক

মীমাংসা।

ঢাকা হিন্দুসমাজকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা।

ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৫ই জুন। ১৮৮২।

মূল্য ।৵০ আনা।

ভূমিকা।

ত্রিপুরা জাতি ও ত্রিপুরার রাজ বংশীয় গণ আবহমান কাল হইতে সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ছিলেন। সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কয়েক জন অধীনস্থ বৈষয়িক ভদ্র সন্তানের সহায়তা বলে, হিন্দু সমাজ ভুক্ত হওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধন মানসে বিক্রমপুর ও পারজোয়ার অঞ্চলের কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজ রাজধানীতে নেওয়াইয়া ত্রিপুরা জাতিকে আচরণীয় হিন্দু জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিতে অনুরোধ করেন।

ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ মধ্যেই কাহারও২ মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা ব্যবহার বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় ও জাতি নাশকর ভাবিয়া প্রথমতঃ রাজপক্ষের ঐ সকল প্রস্তাব অস্বীকার করেন।

পরিশেষে অর্থের মমতায় এবং কুমিল্লার জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি রাজপক্ষীয় কয়েক ব্যক্তির সাগ্রহও সানুকুল অনুরোধে মুগ্ধ হইয়া অধিকাংশ পণ্ডিতই সম্মত হন। কিন্তু ইহাতেও জনৈক প্রধান পণ্ডিত এইব্যবহার নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মকর জ্ঞানে সম্মত হন না। তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকোন জাতিরই স্পৃষ্ট জল পান করেন না। সুতরাং ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্টজল পান করিতে পারেননা বলিয়া আপত্তি করেন। ইহাতে অবশিষ্ট পণ্ডিতেরা নিতান্ত শঙ্কিত হন এবং তাঁহাকে দলেমিশাইতে নাপারিলে মহান অনর্থ ঘটিবে বিবেচনায় পণ্ডিতগণ মধ্যে একব্যক্তি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে দ্বিজাতি সুলভ উপায় বিশেষ দ্বারা সম্মত করিয়া সকলে এক যোগে ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্ট জলাদি উদরস্থ করেন।

তৎপর ঐ সকল পণ্ডিতগণ নিজ২ দেশে আসিয়া দল পুষ্টির নিমিত্ত চুপে২ অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্টজল পান করিয়া বিদায় আনিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই এইরূপ ঘৃণাকর প্রস্তাবে অসম্মত হন। এই ঘটনা উপলক্ষে এই বিবরণ ক্রমে২ দেশরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ হয়। এবং যে সকল পণ্ডিত ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিয়া ছিলেন তাঁহাদের ব্যবহার হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদনীয় নহে বলিয়া ক্রমেই লোকের প্রতীতি হইতে থাকে। সমাজ ম-

ধ্যে এই বিষয়ের আন্দোলন সময়ে ত্রিপুরা মহারাজের জনৈক কর্ম্মচারী এই ঢাকা নগরীতে আগমন করেন। তিনি প্রধান২ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তির বাসায়২ যাইয়া, পাত্র বিশেষে কাহাকে অনুনয় বিনয়, কাহাকে বা রাজসংসারে চাকরি ইত্যাদির প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া এই আন্দোলন স্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন এবং তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্য ও হন। এমন সময়ে ত্রিপুরা রাজ বংশের ও ত্রিপুরা জাতির হিন্দুত্ব ও যে সকল পণ্ডিত আগড়তলায় যাইয়া ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঐ আচরণের বৈধতা প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাজে সমাজে যে এক খণ্ড পত্র প্রেরণ করেন ঐ পত্র এবং তারপাশা নিবাসী রাশবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকটে তিনি যে এক প্রলোভন পত্র প্রেরণ করেন, বিগত ২৪শে মাঘের ঢাকা প্রকাশে মুদ্রিত সেই পত্র, এইদুই পত্র, আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই সকল অপ্রশস্থ গূঢ়াচরণ নিরীক্ষণ করিয়া, আগড়তলা গত পণ্ডিত গণের আচরণের সততা বিষয়ে আমাদের ও সন্দেহ হইতে থাকে। তৎগতিকে আমরা শাস্ত্রীয় বিধান ও ব্যবহার পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন ও কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য নির্ণয়ার্থে গত ১লা ফাল্গুণ রবিবার অত্রত্য পূর্ব্ব বঙ্গ রঙ্গ ভূমি নামক গৃহে এক সভা আহ্বান করি। কিন্তু ঐ সভাতে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত বা মীমাংসা না

হইয়া গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত পত্রের যে এক প্রত্যুত্তর লিপি সভ্যগণ মধ্যে একব্যক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন সভার মতানুসারে ঐ প্রত্যুত্তর পাঠ হইয়া প্রধান প্রধান হিন্দু সমাজে ঐ প্রত্যুত্তর লিপি প্রেরণ করা অবধারিত হয়, তদনুসারে ঐ পত্রিকা প্রধান ২ হিন্দু সমাজে প্রেরণ পূর্ব্বক সমাজের অভিমত জানার কারণ আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকি তাহাতে প্রধান২ হিন্দু সমাজ উক্ত প্রত্যুত্তর পত্রের পোষকতা করিয়া আগড়তলা গত পণ্ডিত গণকে দোষী সাব্যস্থ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু সভা করিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করাতে কতিপয় ব্যক্তি আমাদের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমাদের প্রচারিত উপরোক্ত পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ত্রিপুরা জাতির পোষকতা ও আমাদিগকে নির্য্যাতন মানসে হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ আমাদের প্রতি ভদ্র জনানুচিত গালি বর্ষণ এবং সত্যের অপলাপ ও শাস্ত্রের অবমাননা করিতে ও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেছেন না। ঐ সকলের লিখন ভঙ্গি দৃষ্টে বোধ হয়; গালিদিতে তাঁহারা যতদুর অভ্যাস ও ক্ষমতালাভ করিয়াছেন। যথার্থ তথ্য নিরূপণে তাঁহাদের ততদূর ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই।

প্রতিবাদকারিগণ মধ্যে, একব্যক্তিও ত্রিপুরা জাতি বা ত্রিপুরা রাজবংশীয় গণের স্পৃষ্ট জল যে কখনও চতুর্ব্বর্ণের হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল, একথা প্রতিপন্ন করিতে বা লিখিতে সাহস করেন নাই। তাঁহারা

সৃষ্টির পরক্ষণে সত্যযুগে এই রাজ বংশের আদিপুরুষ ক্ষত্রিয় (যযাতি) ছিলেন। মাত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ কারীই ত্রিপুরা রাজবংশীয়েরা চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির সন্তান। একথা শুদ্ধ তাঁহাদের কলম কালীর জোরে ভিন্ন কোন ও যথার্থ শাস্ত্রোক্ত বিধান বা বিশ্বাস্য কোন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরা জাতি যযাতির সন্তান হওয়া অসম্ভব কি? যযাতি দ্রুহ্যুকে পশ্চিমদিকে রাজ্য প্রদান করিয়া থাকিলে ও পূর্ব্বদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন অসম্ভব কি উহা অসম্ভব হইলে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের ও সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ভারতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন অসম্ভব? এইরূপ অশ্রদ্ধেয় ও হাস্য জনক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং কেহবা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থনার্থ, তন্ত্র শাস্ত্রের নামে অতি আশ্চর্য্য জনক অভিনব গল্প রচনা, ও কেহবা রাজরত্নাকর নামে অজ্ঞাত পুস্তকের নাম করণ করিয়াছেন। কিন্তু ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্টজল যে চিরকাল হিন্দুজাতির অব্যবহার্য্য। একথা ঐ সকল প্রতিবাদ পত্র হইতে ও অতি বিশদ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে।

ত্রিপুরা জাতি বা ত্রিপুরার রাজবংশীয়েরা যে হিন্দু সমাজ ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার যে হিন্দু শাস্ত্র মতে সদাচরণ ও সদব্যবহার কোন শাস্ত্রীয় বিধান বা প্রত্যক্ষ প্রমান দ্বারা তাহা প্রতি

পেন্ন হয়না। তাঁহাদের আহার ব্যবহার, বিবাহ পদ্ধতি এবং পূর্ব্বপুরুষ গণের নামাবলীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেও, তাঁহারা যে হিন্দুগণ হইতে পৃথক জাতিছিল, কেবল দীর্ঘ কাল হিন্দুদিগের পার্শ্ব দেশে অবস্থান নিবন্ধনে কথঞ্চিৎ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ইদানীং অভ্যাস করিয়াছেন একথা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকে।

যাহা হউক, জাতি ও ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঐ সকল প্রতিবাদ কারিগণের যুক্তির বলাবল ও উক্তির সত্যাসত্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। তজ্জন্য তদা আমরা পুনর্ব্বার ঐ বিষয় সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম অধ্যায়।

ভট্টাচার্য্য প্রকরণ।

এই সকল প্রতি বাদ কারিগণের প্রথম সুভড্যা নিবাসী কৃষ্ণানন্দ সার্ব্ব ভৌম মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত দুর্গা চরণ ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যান্য প্রতিবাদকারীর ন্যায় বাক্ যোদ্ধা নহেন। তিনি মহা কথা নামক গ্রন্থের নামে কয়েকটী শ্লোক প্রচার করিয়া ত্রিপুরাররাজ বংশীয় দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতি পন্নের প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং ঐ মহা কথা কামাখ্যা নামক তন্ত্রের অষ্টচত্বারিংশৎ পটলের অন্তর্গত বলিয়া ব্যক্ত করতঃ কহিয়াছেন যে ঐ মহা কথা রঙ্গ পুরান্তর্গত কাকিনীয়ার ভূম্যধীকারীর বাড়ীতে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইতে পারিবে।

আমরা পাঠক গণের বোধ সৌকর্য্যার্থে উক্ত শ্লোক কয়েকটীর মধ্যে যে কয়েকটী শ্লোকের সহিত ত্রিপুরার রাজ বংশের সম্পর্ক সূচিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। তাহা এই "ব্রহ্মা কহিলেন (নারদকে)। একদা গৌরবিনী লক্ষ্মী ক্ষিরোদ সমুদ্রের উত্তর তটে ক্রিড়ন বনে স্বামী গুণবর্ণন করিতে২, কহিলেন, আমার স্বামী সর্ব্বজ্ঞ। কেশব হইতে অন্য কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ? কেশব ভিন্ন অন্য কোন দেবতা ইবা সৃষ্টি সংহার ও পালন করেন?। কে ইবা

অতীত অনাগত মহৎ বৃত্তান্ত জানেন। পার্ব্বতী ইহাতে রোমান্বিতা হইয়া কহিলেন, লক্ষি, তুমি অহঙ্কার বশে কি কহিতেছ ?। বিষ্ণু সৃষ্টি কর্ত্তা কোথায় ?। মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা কে ? বিষ্ণু আমার পতির ষোড়শাংশের যোগ্য ও নহেন। উভয়ের এইরূপ বিবাদ দেখিয়া ব্রাহ্মী দেবী মধ্যস্থা হইয়া কহিলেন। তোমরা বিবাদ করিওনা। কল্য প্রভাতে আমার সাক্ষাৎ যাঁহার ভর্ত্তা নূতন কহিয়াছেন বলিয়া কহিতে পারিবে। তাহার ভর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ হইবেন। অতএব যাও আপন২ ভর্ত্তার নিকট যাইয়া জিজ্ঞসা কর। এই কথা হইলে পর, লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া কেশবকে কহিলেন, স্বামিন্ আজ পার্ব্বতী আমাকে নিতান্ত অপমান করিয়াছেন। তোমা হইতে মহাদেব শ্রেষ্ঠ তিনি এই কথা বারম্বার বলিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে আপনি মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম মহিষী আমাদের এই বিবাদ শুনিয়া কহিলেন, কল্য প্রভাতে যাহার ভর্ত্তার কোন নূতন মহৎ কথা এখানে বলিতে পারিবে। তাহার স্বামীই শ্রেষ্ঠ প্রভু বলিয়া অবধারিত হইবেন। অতএব আমাকে অদ্য শিবের অজ্ঞাত মনোহর নূতন বার্ত্তা শ্রবণ করাও। কেশব লক্ষ্মীর এই অশ্রাব্যকথা শ্রবণ করতঃ তাহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন ; তুমি কি কহিতেছ। মহাদেব হইতে বড় কে ? আমি শিবভিন্ন অন্য জানিনা। শিব আমার গুরু। আমি শিবের অজ্ঞাত কোন বার্ত্তাই জানিনা। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিগে মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয়ার্থে কহিলেন, আমি নূতন বার্ত্তা কহিতেছি, এই বার্ত্তা কেশব ও জ্ঞত নহেন। শশাঙ্ক বংশে যযাতি নামে এক মহান ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু, মধ্যম অনু, কনিষ্ঠ পরু। দ্রুহ্যুর কামা ও রমা নামে দুই পত্নীছিল। ঐ দুই পত্নীর মধ্যে গুরুতর সাপত্ন্য কলহ ছিল। দ্রুহ্য কামার প্রতি প্রীতিবশতঃ রমাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করেন। ঐ সময় রমা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি বন মধ্যে দুই যমজ কুমার প্রসব করেন। রমা প্রসব বেদনাতে অচৈতন্য ভাবে আছেন। এই অবসরে নর্ম্মদ নামক এক রাক্ষসের কল কঞ্জরী নাম্নী অপুত্রা পত্নী, কনিষ্ঠটীকে হরণ করিয়া লইয়া, পালক পুত্র করিল। এবং নর্ম্মদ রাক্ষস ঐ বালকের উগ্রপ্রতাপ নাম করণ করিল। উগ্রপ্রতাপ তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি অনেক কষ্টে আরাধনা করিয়া দিবাকরকে প্রসন্ন করিলেন। দিবাকর প্রসন্ন হইয়া উগ্রপ্রতাপকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে, উগ্রপ্রতাপ কহিলেন হে সুরেশ্বর, আমি আপনার দর্শন লাভেই কৃতার্থ হইয়াছি যদি আমাকে বর দানই করেন, তবে হে বিভো! আমি কোন স্থানে বাস করিব, আমার ভার্য্যা কোথায় আছে? আমার রাজ্য কি? এবং পুত্র কে হইবে? (বলুন)।

দিবাকর বলিলেন, হে মহামতে, তুমি উদয় গিরির সন্নিকটে ত্রিপুরা অঞ্চলে উদব গ্রামে বাস কর। হে সুব্রত আমি তোমাকে ধন্যা ও অতিমনোরমা গান্ধর্ব্বী পত্নী প্রদান করিতেছি। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। এবং তথায় পুরী নির্ম্মাণ কর। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার বংশধরগণ সুখে রাজত্ব করিবে। আমি মাণিক্য মৌলি সন্তোষের সহিত বর দিলাম। পৃথিবীতে তোমার সন্তান মাণিক্য বলিয়া বিখ্যাত হইবে। সূর্য্যদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তাহার

নিয়োগানুসারে, প্রতাপশালী, উগ্রপ্রতাপ উদয়পুরে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অন্যগুপ্য তাহার সন্দেহ নাই। অয়ি প্রিয়ে! দেবি, তুমি ক্ষীরোদধি তটে যাইয়া এই কথা বল। হে পার্ব্বতী সত্য সত্যই এই বিবরণ বিষ্ণুও জ্ঞাত নন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচারিত কবিতা কয়েকটী দ্বারা জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজ পরিবার যে দ্রুহ্যুর সন্তান, একথা কেবল আমাদের নিকট নূতন নহে। দেব লোকের নিকট ও নূতন। প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ভগবান বিষ্ণুর নিকটও নূতন। কেবল ঐ বৃত্তান্ত নূতন নহে। যযাতির তিনপুত্র মাত্র একথাও নূতন। দ্রুহ্যুর দুই স্ত্রী একথাও নূতন। এই নূতন কথা কত দূর প্রামাণিক ও সত্য, তাহা দেখা যাউক।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচারিত প্রতিবাদ পত্রের প্রারম্ভেই লিখিত আছে যে উক্ত মহাকথা নামক গ্রন্থ রংপুরের অন্তর্গত কাকিনীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর আলয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। উহাদ্বারা ঐ গ্রন্থও ঐ বিবরণ যে অন্য কোন স্থানেই প্রাপ্তব্য নহে, প্রকারে তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকটে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচারিত শ্লোক গুলি কামাখ্যা তন্ত্রের শ্লোক নহে। কামাখ্যা তন্ত্র মধ্যে ঐরূপ কোন বিবরণ নাই।

অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, যে সকল পণ্ডিত আগড়তলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন ইতিপূর্ব্বে, কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারীর আলয়ে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে চাকর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারেন। তিনি তথায় থাকিয়া অনেক বাঙ্গলা উপন্যাস

গ্রন্থ ও সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত ছন্দে অনুবাদ করেন। তিনিই কাকিনীয়ার ঐ মহাকথা গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি অনেক অদ্ভুত গল্প ঐ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অধিক কি সুপ্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাসের কথকগুলি গল্পও উহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত পণ্ডিত প্রবরের সহায়তা বলেই হয়তঃ কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারীর ঐ পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করার মনস্থে ঐ কয়েকটীর শ্লোক ইদানীং রচিত হইয়া থাকিবে। নতুবা যে সকল স্থানে বহুকাল যাবৎ বহুল পরিমাণে সংস্কৃতের চর্চ্চা হইতেছে, তাহার কোন স্থানেই ঐ গ্রন্থ ও ঐ বিবরণ নাথাকার কোন কারণ ছিল না। ফলতঃ কাকিনীয়ার মহাকথা উক্ত পণ্ডিত প্রবরের আধুনিক রচিত গল্পাবলী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

যাহা হউক, ঐ শ্লোক কয়েকটীদ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে দ্রুহ্যর পরিত্যক্তা পত্নীর গর্ভজাত একটী পুত্রকে নর্ম্মদ নামে এক রাক্ষস পালক পুত্র করিয়াছিল। এবং তাহার উগ্রপ্রতাপ নাম করণ করিয়াছিল। সেই উগ্রপ্রতাপ ত্রিপুরা রাজবংশের স্থাপয়িতা, এবং উদয়পুরের প্রথম রাজা এবং সূর্য্যদেবের বর প্রভাবে উগ্রপ্রতাপের সন্তান মাণিক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ উগ্রপ্রতাপ বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্লোকদ্বারা আরও প্রতিপন্ন হয় যে ঐ উদয়পুর উদয়গিরির সন্নিকট।

আগড়তলার গণ্ডশৈলকে হিন্দুগণ উদয়গিরি কহিতেন কি না, এবং সূর্য্যদেব ঐ শৈল হইতে উদয় হইয়া তাপ দান করেন কি না আমরা বাহুল্য ভয়েও অকিঞ্চিৎকর বোধে এস্থলে তাহার কোন মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখন মতে উগ্রপ্রতাপ নর্ম্মদ রাক্ষসের পালক পুত্র ছিলেন। ঐ নর্ম্মদ রাক্ষসই তাহার নাম করণাদি সংস্কার সমাধা করেন। এবং ঐকালে সর্ব্বাংশেই পালক পুত্র বৈধ ছিল। সুতরাং উগ্রপ্রতাপ শাস্ত্রানুসারেই রাক্ষস কুলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতা বিশ্বাস করিলে ত্রিপুর রাজবংশের আদিপুরুষ যে রাক্ষস ছিল ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এক্ষণ দেখা যাউক উগ্রপ্রতাপ ঐ রাজবংশের পুর্ব্বপুরুষ কি না। এবং তিনি উদয়পুর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না। এবং তাহার সন্তান মাণিক্য নামে বিখ্যাত হয় কি না।

উগ্রপ্রতাপ যে ত্রিপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা অথবা তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ ছিলেন অন্য কোন প্রতিবাদকারীই তাহা বলেন না। এবং ত্রিপুর রাজবংশীয়েরা ও উহা স্বীকার করেন না। ত্রিপুরার রাজধানীতে রাজমালানামক এক গ্রন্থমধ্যে যে ত্রিপুরেশ্বরগণের বংশাবলী আছে, তাহাতেও উগ্রপ্রতাপ নামে কোন রাজা বা ব্যক্তি থাকা লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ উগ্রপ্রতাপ দ্রুহ্যু পুত্র হইলে তিনি সত্যযুগের লোক হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে মাণিক্য উপাধি ও উদয়পুর রাজধানী হইলে, তাহা অল্প দিনের কথা নহে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যার সিংহাসনারোহণেরও অনেক পুর্ব্বে হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে উদয়পুর রাঙ্গামাটীয়ারই নামান্তরমাত্র উহা পুর্ব্বাপর রাঙ্গামাটীয়া নামেই প্রসিদ্ধ। কেবল ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বঙ্গদেশ মুসলমানের অধিকৃত হওয়ার ৩৮২ বৎসর পরে, ত্রিপুরাধিপতি গোপীপ্রসাদ উদয় মাণিক্য নাম ধারণ, এবং রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নাম অনুসারে রাজধানীর নাম উদয়পুর করেন। এবং ৬৯২ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১২৭৯

অব্দে ঐ রাজবংশ বঙ্গদেশের মুশলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক মাণিক্য উপাধি লাভ করেন। তৎপূর্ব্বে কাহারও কখন ঐ উপাধি ছিল না।

ত্রিপুরার রাজকীয় ঘটনার কাগজ পত্র এবং ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরাধিপতি রাজধর মাণিক্য যে সবংশের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অবলম্বন করিয়া ভুতপূর্ব্ব ত্রিপুরেশ নন্দন নবদ্বীপচন্দ্র ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামে যে একখানা ইতিবৃত্ত আপন কর্ম্মচারী কৈলাসচন্দ্র সিংহেরদ্বারা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, উক্ত পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

"গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদয় মাণিক্য এই নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরুঢ় হইলেন। তিনি বহুবিধ জলাশয় খনন এবং প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। এবং রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় নাম অনুসারে রাজধানীর উদয়পুর নাম করিলেন"

উক্ত পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কুমার রত্নফা পৈত্রিক রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া গৌড়ে গমন করেন। কিছুকাল পরে তথাকার মুশলমান শাসনকর্ত্তা আদিন তুগরলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। তুগরল রাজকুমারকে যথোচিত সম্মানের সহিত চারি বৎসর গৌড়ে রাখিয়া বৃহৎ একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। রত্নফা ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়া, দেশস্থ প্রাচীন সুহৃদ্বর্গ এবং মুসলমান সৈন্যবলে পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিয়া সপ্তদশ ভ্রাতার মস্তকচ্ছেদন করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ৬৯২ ত্রিপুরাব্দে (১২৭৯ খ্রীষ্টীয়াব্দে) ঘটিয়াছিল। মহারাজ, আদিন তুগরলকে ১০০ শত হস্তী এবং বহুমূল্য বস্তু উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তুগরল তাঁহাকে ৪০০০ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য এবং মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। তদবধি অদ্য

পর্য্যন্ত ত্রিপুরাধিপতিগণ মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন"।

উক্ত ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "যুদ্ধ জয়রায়ের পুত্র জনকফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনক যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ সুনিপুণ ছিলেন। প্রথমেই রাজ্য বিস্তারের আশা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় হইয়াছিল সৈন্যগণকে ভালরূপ শিক্ষিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে ত্রিপুরার দক্ষিণসীমা বৃদ্ধি করার মানসে তিনি গোমতী নদীর দক্ষিণপারস্থ রাজ্য সকল আক্রমণ করেন। রাঙ্গামাটীয়ার অধীশ্বর লিক্কারাজ দশ সহস্র সুশিক্ষিত পদাতির সহিত কুকিগণের সাহায্যে মহারাজ জনককে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি পদে পদে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। জনক লিক্কের রাজধানী রাঙ্গামাটীয়াতে ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপন করেন"।

এই ইতিহাস ত্রিপুর রাজবংশীয় একব্যক্তির অভিমতে লিখিত হইয়াছে, উহার লিখিত ঘটনাবলী, ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা মহারাজ রাজধর মাণিক্যের লিখিত বংশবিবরণ ও বহুকালের রাজকীয় কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং উদয়পুর অধিকার ও উহাতে রাজধানী স্থাপন এবং মাণিক্য উপাধি ধারণ সম্বন্ধে ঐ ইতিবৃত্তে যাহা লিখিত হইয়াছে। তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। উদয়পুর জেতা জনকফার সময় ঐ ইতিবৃত্তে উল্লেখ নাই বটে কিন্তু তিনি রত্নফার ২৫ পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিমাত্র। এক্ষণ পাটকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন দ্রুহ্যুর পুত্রের সময়ে উদয়পুর বর্ত্তমান ছিল কিনা। এবং ঐ সময় হইতেই অর্থাৎ মান্ধাতার রাজত্বের সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানে ত্রিপুরেশগণের রাজধানী কিনা।

ফলতঃ সুচতুর পণ্ডিত মহাশয়গণ ত্রিপুরা রাজবংশীয়গণের আধুনিক কয়েক পুরুষের মাণিক্য উপাধি এবং ভূতপূর্ব্ব রাজধানীর নাম উদয়পুর শ্রবণ করিয়া যে এই শ্লোক কয়েকটী সংপ্রতি রচনা করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহা হউক এক্ষণ তন্ত্র কাহাকে কহে এবং তন্ত্রের মত বিষ্ণু অজ্ঞাত ছিলেন কি না, তাহা দেখা যাইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের অপর নাম আগম। তাহাতে উক্ত হইয়াছে,—

"আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥"

অস্যার্থ। মহাদেব পার্ব্বতীর সমক্ষে ভগবান বিষ্ণুর যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাকে আগম (তন্ত্র) শাস্ত্র কহে।

এই বচনদ্বারা তন্ত্রশাস্ত্র স্বয়ং বিষ্ণুর মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব যাহা বিষ্ণুর মত, তাহা তিনি নিজে জ্ঞাত ছিলেন না। কয়জন স্বজ্ঞানশীল ব্যক্তি এ কথা লিখিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন এই বৃত্তান্ত (দ্রুহ্যুতনয়ের উদয়পুর আগমন) বিষ্ণুও জ্ঞাত নহেন; তখন উহা বিষ্ণুর মতও নয়; সুতরাং উহা তন্ত্রশাস্ত্রও নয়। অতএব নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচারিত শ্লোক কয়টী তন্ত্রশাস্ত্রের শ্লোক নয়।

যাহা হউক ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া এইরূপ খেইল খেলা, এবং যাহাতে নিজের ও অন্যের ধর্ম্ম নাশের সম্ভাবনা আছে তাহা লইয়া এরূপ চাতুরী করা কম দুঃসাহসের কর্ম্ম নহে। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সদাচরণদ্বারা সকলের আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া জাতি ও ধর্ম্ম নাশকর অপেয় পান ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেছেন এবং আপন দোষের

নিমিত্ত লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া, তদ্বিপরীতে আপনার দোষ ছাপানের মনস্থে শাস্ত্রের নামে অভিপ্রেত বচন রচনা করিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা ও হীনতার অবস্থা কি আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঢাকাপ্রকাশ প্রকরণ।

আপত্যকারী ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, হিন্দু সমাজের প্রতি কখনও গ্রাম্যদল, কখনও নাম মাত্র হিন্দু, কখনও বর্ব্বর, কখনও দংশন করিতে উদ্দত, এইরূপ সুললিত ও ভদ্র জনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া হিন্দু সমাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এবং কখনও প্রেরিত পত্র রূপ মধুময় মুখদ্বারা হিন্দুগণের সমাজ স্থানকে কিস্কিন্ধ্যা ও হিন্দুগণকে হনুমান বলিয়া উল্লেখ করতঃ নিজের শীলতা ও ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের ঐরূপ অমানুষিক সুজনতা দেখিয়া যেরূপ প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃঢ়তর যুক্তি ও অদ্ভুত বহুদর্শিতার পরিচয় পাইলে ততোধিক বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের কত দূর আস্থা আছে এবং স্থানীয় ও সামাজিক ঘটনাদি উপলক্ষে তিনি কতদূর সম্পাদকোচিত স্বাধীনতা ও নিরপক্ষপাতিতা সমরক্ষণে সমর্থ, তাহা বোধ হয়, যাঁহারা দীর্ঘকাল ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট অবিদিত নাই। উপরোধ আদি নানা কারণে, নানা সময়ে, ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের অধীন হইয়া পড়েন। উপস্থিত ত্রিপুরা ঘটিত

আন্দোলন বিষয়ে ও তিনি প্রথমে নীরব থাকিয়াই একরূপ নির-পক্ষপাতিতা ও কর্ত্তব্য তৎপরতা দেখাইতেছিলেন। কিন্তু পরি-শেষে কারণ বশতঃ তাঁহার মুখ খুলিয়া গেল। যেই বিশিষ্ট লোকের অনুরোধ পড়িল অমনি তিনি স্রোত মুখের তৃণের ন্যায় এক দিগেই চলিতে লাগিলেন।

আমরা কোন রূপ রোষ বা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ঢাকাপ্রকাশ সম্বন্ধে ঐরূপ লিখিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। সরলবুদ্ধি ঢাকাপ্রকাশ নিজ মুখেই তাহা স্বীকার করি-য়াছেন, বিগত ২৯এ ফাল্গুণের ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকাতে একজন পত্রপ্রেরক (বোধ হয় এই ত্রিপুরা ঘটিত আন্দোলন বিষয়ে উদাসীন) সম্পাদককে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে "আজি কালি আপনি ও ত্রিপুরাঘটিত দলাদলির ঝোকে গা ঢালিয়া সম্পাদকীয় মূল্যবান সময় নষ্ট ও সাধারণের আদৃত ঢাকাপ্রকাশের ২।৩ টী কলম বৃথা ব্যয় করিতেছেন বলিয়া, আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পত্রপ্রেরকগণ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ২ পক্ষ সমর্থন করে করুক, কিন্তু মূল্যবান সম্পাদকীয় স্তম্ভ দলাদলির প্রবন্ধে কলঙ্কিত করা কখন ও বাঞ্ছিত নয়, সম্পা-দকগণের চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে, বিক্রমপুরের কয়েক জন পণ্ডিত সম্বন্ধে যে আন্দোলন সম্প্রতি উপস্থিত হই-য়াছে, তাঁহাদের সহিত সাধারণের কোন রূপ সংশ্রব নাই। সামাজিকগণ বলিতেছেন, পণ্ডিতগণ আগড়তলায় যাইয়া ত্রিপুরা (টিপরা) জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিয়া দোষী হইয়া-ছেন। তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্য করা উচিত। পণ্ডিতগণ বলি-তেছেন ঐ জল পান করাতে কোন দোষ হয় নাই। আমরা প্রায়োশ্চিত্য করিতে বাধ্য হইতে পারি না এই মত বিভিন্নতা জনিত আন্দোলনে সাধারণের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। ইহা

দ্বারা কোন রাজবিপ্লব বা সামাজিক বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। ইহার শেষ হয় পণ্ডিতগণের কয়েক পণ কড়ি ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত, নয় সামাজিকগণের মৌনাবলম্বন। এজন্য ঢাকাপ্রকাশের ন্যায় পত্রের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। ভরসাকরি আপনি আমাদের এমতের ঔচিত্য স্বীকার করিয়া আপন পদ গৌরব রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

এই পত্র পাইয়াও সাধারণে ঢাকাপ্রকাশকে কি মনে করিতেছে তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ঐ পত্রের উত্তরে অন্যান্য কয়েক অসার কথা লিখিয়া শেষ লিখিয়াছেন যে "পুর্ব্বে আমরা এবিষয়ে মৌনি ছিলাম বলিয়া বহুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুযুক্তও হইয়াছি এইসমস্ত কারণে আমরা ঢাকাপ্রকাশে এতৎ আলোচনা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি"

পাঠক বোধ হয় ইহারা ঢাকাপ্রকাশের মৌনব্রত ভঙ্গের কারণ বুঝিতে পারিতেছেন এবং আমাদের উক্তির ও যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এই ঢাকানগরের অনেকেই নানা কারণে পূর্ব্ব হইতে ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের বর্ত্তমান আচরণের অবশ্যম্ভাবীতা অনুমান করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পক্ষাবলম্বন বশতঃ তাঁহার হিতাহিত বোধ ও ন্যায় অন্যায় জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। নিজে যে কি পদার্থ সর্ব্বাংশে তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহাকে যাহা বক্তব্য নয়, তাহা বলিতেছেন।

ঢাকাপ্রকাশ ত্রিপুরজাতি স্পৃষ্ট জল পায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দোষ ক্ষালন উদ্দেশে পূর্ব্বাবধি আগড়তলাতে পণ্ডিতগণের যাতায়াত আছে বলিয়া গত ২২ শে ফাল্গুণের পত্রিকায়* কয়েক জন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করতঃ নিম্ন লিখিত যুক্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন "উপরি উক্ত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যদি ত্রিপুরাধিপতিকে অক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া জানিতেন। তাহা হইলে কদাচ তৎপ্রদত্তদান প্রতিগ্রহ করিতেন না।'

"যে সকল পণ্ডিতের মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল নিয়ত কণ্ঠস্থ ছিল, শাস্ত্রানুযায়ী পাপ পুণ্যের প্রতি যাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা কোন ও কার্য্যানুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতিকে অক্ষত্রিয় রাজা জানিয়া তদ্দত্ত দান প্রতিগ্রহ দ্বারা ঘোরতর মহা পাতক ভাগী হইতে গিয়াছিলেন। এমন বর্ব্বর কে যে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে।"

"পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা রাজার বা রাজবংশীয়গণের স্পৃষ্টজল পান করিয়া না থাকিলেও এক্ষণ তৎ .ন কোন ও দোষ হইতে পারে না।"

পণ্ডিতগণ অক্ষত্রিয় বলিয়া না জানিয়া জল পান করিয়াছেন সুতরাং দোষী হইতে পারেন না বা অল্প দোষের ভাগী হইয়াছেন, উহা যদি সম্পাদকের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমাদের ঢাকাপ্রকাশ পর্য্যালোচনার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু ঢাকাপ্রকাশ ঐ লেখার ঐ অর্থ মনে ভাবিয়া লিখেন নাই। যখন পণ্ডিতগণ ত্রিপুরেশ্বরের দান স্বীকার করিয়াছেন তখনই ত্রিপুরেশ্বর ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ইহাই তাহার ঐ লেখার অভিপ্রেত অর্থ ও গাঢ়তর যুক্তি।

যাহা হউক পণ্ডিতগণ যে ত্রিপুরাপতিকে ক্ষত্রিয় জানিয়া তদ্দত্ত দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণই নাই। যদি পণ্ডিতগণ অভ্রান্ত হইতেন, লোভ মোহাদি বর্জ্জিত হইতেন, শাস্ত্রবিহিত সদাচার সমরক্ষণে নিয়ত যত্নবান হইতেন তাহা হইলে আমরাও পণ্ডিতগণের আচরণের উপর

কোনরূপ দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। কিন্তু যখন এই সকল পণ্ডিত অভ্রান্ত নন, লোভ মোহাদি বিবর্জ্জিত নন, তখন তাঁহারা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, ধর্ম্মে ভয় করিয়া, সর্ব্বদা সকল কার্য্য যে করিতেছেন, বিনা প্রমাণে তাহা কি বলিয়া বিশ্বাস করিব। যখন দেখিতেছি, ইতিপূর্ব্বে ইংলিস গবর্ণমেণ্টের নিকটে ও পণ্ডিতশ্রেণীর যথেষ্ঠ সমাদর ছিল। গবর্ণমেণ্ট উচ্চতম বিচারাদালত সমূহে ব্যবস্থা প্রদানার্থ পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐরূপ উচ্চতমপদারূঢ় থাকিয়াও কুপ্রবৃত্তি নিবন্ধন উৎকোচ গ্রহণ করিয়া পিশাচের ন্যায় ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা ও অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিয়া মত প্রদান করিতেন। এবং এই জঘন্য আচরণবশতঃ বিচারাসন হইতে নিতান্ত ন্যক্কারের সহিত বহিষ্কৃত হইয়াছেন। তখন কি বলিয়া পণ্ডিতমাত্রকেই সদাচার সম্পন্ন ধর্ম্মভীরু নির্লোভী ও ন্যায়পর মনে করিব। এবং কি বলিয়াই বা তাহাদের আচরণ মাত্রকেই সদাচার বলিয়া মনে স্থানদান করিব। সেই সময় হইতে এক্ষণকার পণ্ডিতগণের কি শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান অধিক হইয়াছে। যখন দেখিতেছি আগড়তলা গত, পণ্ডিতগণ মধ্যে এক ব্যক্তি অন্যান্য অতি লোভাক্রষ্ট পণ্ডিতগণের অনুরোধ কোনক্রমে এড়াইতে না পারিয়া পশ্চাৎ শূদ্রাদি জাতির স্পৃষ্ট জলও তিনি পান করেন না বলিয়া আপত্য করাতে, কোন২ পণ্ডিত তাঁহাকে বাধ্য করিবার জন্য অনেকরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; পরিশেষে সকলে একযোগে প্রচুর অর্থ লইয়া ত্রিপুরা জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিতে সম্মত হইয়াছেন তখন ত্রিপুরা জাতি স্পৃষ্টজল যে তাহাদের নিকট ঘৃণাকর ও প্রত্যাপারজনক অপেয় ছিল না। এবং দুর্নিবার লোভই যে তাহাদিগকে এই দুষ্কর্ম্মে মতি লওয়ায় নাই এ কথাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ফলতঃ পণ্ডিতগণ যে

জানিয়া শুনিয়া অর্থলোভে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। জাতীয় গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষের জলপিণ্ড লোপ করিয়াছেন। এবং এক্ষণও সংসর্গ-নিবন্ধন অন্যেরও জাতি নাশের হেতুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর প্রত্য-পায়ভাগী হইতেছেন। ইহাই যদ্রূপ প্রতীতি হয় ক্ষত্রিয় জানিয়া বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বা ভ্রমবশতঃ অপেয় পান করি-য়াছেন, কোনক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় না।

ঢাকাপ্রকাশের আর এক কথা এই "পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা রাজার বা রাজবংশীয়গণের স্পৃষ্ট জল পান করিয়া না থাকিলেও এক্ষণ তৎপানে কোনও দোষ হইতে পারে না।"

কেন যে দোষ হইতে পারে না আমরা এ কথা বুঝিতে পা-রিলাম না। কারণ হিন্দুধর্ম্মের জাতিবিভাগ আচারমূলক। চির-কালের অব্যবহার্য্য ও অনাচরণীয় জাতিকে চল করিয়া লইলে কলির কাল মহাত্মে যে একাচ ...র আশঙ্কা আছে তাহারই ঘটনা হইয়া প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ জলপান ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য কিনা তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

পণ্ডিতগণের দোষ ক্ষালনার্থ ঢাকাপ্রকাশের দ্বিতীয় যুক্তি এই—

"বহুকাল হইতে এদেশে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হিন্দুসমা-জের উপর আধিপত্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। সমাজও তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। সমাজস্থ কেহ হিন্দু-ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিলে যে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুযায়ী প্রায়-শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সমাজভুক্ত হইতেছেন, আজি সেই পণ্ডিত-গণই কোনও কোনও দলের নিকট দোষী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ ইহা সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে।"

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক কিরূপ হিন্দুসামাজিক লোক এবং হিন্দুগণের সামাজিকতাবিষয়ে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ এই যুক্তিদ্বারা অনেকে অনুমান করিতে পারিতেছেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে সকল প্রধান২ হিন্দুসমাজ আছে, উহার কোন সমাজেই পণ্ডিতগণ অধিপতি নহেন এবং কোন কালে কোন সমাজই অবনত মস্তকে পণ্ডিতগণের শাসন শিরোধার্য্য করেন নাই। এবং কখনও কোন সমাজের, উপর কোন পণ্ডিত আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বা প্রত্যাশাও করেন নাই। হিন্দুগণ চিরকাল হইতেই বিদ্যার গৌরব করিতে অভ্যস্ত, সেই গুণেই তাঁহারা এতকাল পণ্ডিতগণের আদর করিয়া আসিতেছেন মাত্র। মর্য্যাদাশালী সদ্বংশীয়গণই হিন্দু সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের অনুগৃহীত ও আশ্রিত মাত্র। সমাজের কেহ কোন দোষ করিলে সমাজই তাঁহার শাসন করেন। সমাজ দোষ না ধরিলে অন্যের দোষ ধরার অধিকার নাই এবং অন্যের কথায় তিনি দোষীও নহেন প্রধান২ শ্রোত্রিয়, বংশজ ও কুলীন প্রভৃতি সম্মানিত হিন্দুগণই সমস্ত হিন্দুসমাজের অধিপতি। যাজনিক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ আবশ্যকতা বশতঃ যেভাবে সকল সমাজেই আদৃত হইতেছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও সেইরূপ সমাজে আদৃত হইয়া থাকেন। এবং বিদ্যাদি সদ্গুণ অনুসারে সমাজ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত ও আদৃত হন মাত্র। সামাজিক শক্তির সম্মুখে পণ্ডিতগণের আধিপত্য খাটে কি না, ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের তাহা অবগত থাকার সম্ভাবনা অতি অল্প।

বিক্রমপুরে বাঘিয়া বজ্রযোগিনী আরিয়ল, তারপাশা, রাজনগর, নৈরা, উপশি ও দোহার, চন্দ্রপ্রতাপ অঞ্চলে রোয়াইল, মহাদেবপুর প্রভৃতি যে সকল প্রধান২ হিন্দুসমাজ আছে, তাহার কোন

সমাজেও কি কখনও কোন পণ্ডিত আধিপত্য করিতে পারেন, না কখনও আধিপত্য করিয়াছেন? বরং হিন্দুসমাজই সময়ে২ পণ্ডিতগণের প্রায়শ্চিত্ত ও সমন্বয় আদি করিয়াছেন, তাহার ভূরি২ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফলতঃ পাণ্ডিত্য ও যাজনিক আদির ন্যায় এক ব্যবসায় মাত্র।

অতঃপর ত্রিপুরাধিপতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্নের উদ্দেশ্যে ২৯এ ফাল্গুনের পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে—

"ত্রিপুরা রাজবংশের এক ঐতিহাসিক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাহার নাম রাজ রত্নাকর। উহাতে ভগবানচন্দ্র হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের পিতৃ জীবনচরিত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। অদ্যাপি ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত হয় নাই। রাজরত্নাকরে বর্ণিত আছে, যযাতি তনয় দ্রুহ্য পিতৃশাপে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া কপিলাশ্রমের অনতিদূরে ত্রিবেগ নামক নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় বসতি করিলেন। দ্রুহ্য সমীপস্থ বহুদেশ অধিকার করিলেও রাজ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রুহ্য তনয় বভ্রু স্বীয় পিতার পরলোক গতির পর রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। দ্রুহ্যর তনয়গণ ভোজ নামে খ্যাত হইলেন।"

আমরা প্রথম প্রতিবাদকারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে এক নূতন কথা শুনিয়াছি। ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের মুখে আবার রাজরত্নাকর নামে এক নূতন ইতিহাসের নাম শুনিতে পাইলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নূতন কথা ত্রিলোকের অজ্ঞাত থাকার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই; কিন্তু বুদ্ধিমান ঢাকাপ্রকাশ তাঁহার নূতন পুস্তক লোকের অজ্ঞাত থাকার একটী কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া অদ্যাপি সাধারণ সমীপে উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ যে ভাবে

কাকিনীয়ার মহাকথার সৃষ্টি, সেইরূপ রাজরত্নাকরও আধুনিক রচিত হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুরার কোন প্রাচীন ইতিবৃত্ত নাই। ঐ নামে কোন প্রাচীন গ্রন্থ থাকিলে এবং পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান মহারাজের জীবনবৃত্ত পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে লিখিত থাকা প্রকৃত হইলে এতকাল প্রধান২ রাজকর্ম্মচারী ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ত্রিপুরেশ্বর তনয় নবদ্বীপচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র সিংহের দ্বারা যে ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়াছেন, রাজরত্নাকর প্রকৃত হইলে ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকার ও ঐ ইতিবৃত্তে তাহার নাম না থাকার কোন কারণ ছিল না। ঐ ইতিবৃত্তের ভূমিকাতে লিখিত আছে যে, "শ্রদ্ধাস্পদ নরেশ নন্দনের (নবদ্বীপচন্দ্র) সাহায্যে ত্রিপুরার রাজকীয় প্রাচীন ঘটনা সম্বলিত কাগজ পত্র সংগ্রহ করিলাম। তন্মধ্যে রাজমালা ও মহারাজ রাজধর মাণিক্য স্ব বংশের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; এই দুইখানি গ্রন্থ এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ত্রিপুরা সম্বন্ধে লিখিত অনেকগুলি পত্রের সাহায্যে এই পুস্তকখানি প্রণীত হইল।"

ঐ বিজ্ঞাপনে আরও লিখিত হইয়াছে যে "ন্যূনাধিক ৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত "রাজমালা" বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

যদি ঢাকাপ্রকাশের লিখানুসারে রাজরত্নাকর নামে প্রকৃত ইতিবৃত্ত থাকিত, তাহা হইলে সিংহ মহোদয় অবশ্য তাহার নাম করিতেন এবং তাহার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু ঐ ইতিবৃত্তে তাহার নাম গন্ধও নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ব হইতে ধারাবাহিকরূপে ঐরূপ ইতিহাস থাকিলে ত্রিপুরাধিপতি রাজধর মাণিক্য স্ববংশের এক স্বতন্ত্র বিবরণ কখনও লিখিতেন না। ফলতঃ রাজমালা

ও রাজধর মাণিক্যের ঐ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভিন্ন রাজ রত্নাকর নামে ত্রিপুরার কোন প্রাচীন ইতিবৃত্ত নাই।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ত্রিপুরাজাতির ভাষা সংস্কৃত নহে এবং অদ্য হইতে ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রাজমালা ও বঙ্গভাষাতে লিখিত এরূপ অবস্থাতে ঐ গ্রন্থ অদ্যাপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইতেছে ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ যখন ত্রিপুরা জাতিকে পবিত্র করার উৎযোগে আছেন, তখন সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষায় উহা লিখিত হওয়ার প্রত্যাশা কি ?

এক্ষণ দেখা যাউক ঢাকাপ্রকাশের রত্নাকরের মত সর্ব্ববাদি সম্মত প্রামাণিক ও সত্য কিনা। ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন স্বয়ং দ্রুহ্যু ত্রিবেগনাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন এবং তৎপুত্র বভ্রু ঐ নগরীর প্রথম রাজা হন। ঐ ত্রিবেগ নগরী ব্রহ্মপুত্র নদের তটে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত বা তন্নিকট। সুতরাং হস্তিনা পুরী হইতে সম্পূর্ণ পূর্ব্বদিকে।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রচারিত প্রথমপত্রে বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থাংশের একাদশ অধ্যায় হইতে দেখান হইয়াছিল যে—

" দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং প্রত্যথাদিশৎ।
প্রতীচ্যাঞ্চ তথাদ্রুহ্যং দক্ষিণাপথতো যদুং ॥
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবানুং কৃত্বামণ্ডলিনো নৃপান্।
সর্ব্বপৃথ্বী পতিংপুরুং সোভিষিচ্য বনং যযৌ।

অর্থাৎ (যযাতি) দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে তুর্ব্বসুকে পশ্চিমদিগে, দ্রুহ্যকে দক্ষিণাপথে যদুকে, উত্তরদিগে অনুকে অধীন শাসনকর্ত্তা করিয়া পুরুকে সর্ব্বপৃথ্বী রাজ্যে অভিষেক করিয়া বন গমন করিলেন। যযাতির শাপ বশাৎ দ্রুহ্য পুরু হইতে জেষ্ঠ হইয়াও

পৈত্রিক রাজাধিরাজ সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পিতৃ নিয়োগমতে পশ্চিম দিগস্থ খণ্ড রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিগের নহে। এবং দ্রুহ্যু যযাতির শাপে পৈত্রিক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন না। তিনি পিতার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ বিশেষের অধীন শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

এক্ষণ পাঠকগণ মহর্ষি প্রণীত বিষ্ণুপুরাণের মত সত্য বলিয়া দ্রুহ্যকে হস্তিনাপুরীর পশ্চিমদিগস্থ অধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। না ঢাকাপ্রকাশের বত্নাকরের মতে তাহাকে পৈত্রিক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপারে স্থাপিত করিবেন। বিশেষতঃ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে রাজমালার সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বয়ং ত্রিপুরাধিপতি রাজধর মাণিক্য যে বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বভ্রু নামে দ্রুহ্যুর কোন পুত্র থাকা কি বভ্রু নামে কোন ব্যক্তি ত্রিপুরার সিংহাসন লাভের কথাই নাই, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুর সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখিয়াছিলেন। পরে ত্রিপুরের বিধবা রমণীর গর্ভজাত ত্রিলোচন রাজ্যেশ্বর হন। ইতি-পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ হইতে দ্রুহ্যুর যে বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তৎদৃষ্টে ঢাকাপ্রকাশ অথবা রাজরত্নাকরের রচক সতর্ক হইয়া ত্রিপুর ত্রিলোচন প্রভৃতি নামের পরিবর্ত্তে বভ্রু ও সেতু নাম লিখিয়াছেন এবং ত্রিপুরা রাজ বংশের পার্ব্বত্যজাতি সুলভ প্রাচীন কতকগুলি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কতকগুলি ক্ষত্রিয়জাতি সুলভ নূতন নাম বসাইয়াছেন। নতুবা, রাজমালা, রাজধর মাণিক্যের লিখিত বংশ বিবরণ এবং ইতিবৃত্তের সহিত তাহার সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকার কোন কারণান্তর ছিল না। উক্ত ইতিবৃত্ত ও রাজমালামতে ত্রিপুরাধিপতির পূর্ব্ব পু-

রুষগণের নাম, কালতরুফা, তেজাঙ্গ তা সচুঙ্গ ক্ষেত্রফা দান কুরুফা, কুরঙ্গফা ইত্যাদি ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

"দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ।
আরব্ধস্তস্য গান্ধার স্তস্য ধর্ম্ম স্ততোধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্ম্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসংশতং।
ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভুবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ॥

অর্থাৎ দ্রুহ্যর তনয় বভ্রু, বভ্রুর পুত্র সেতু সেতুর পুত্র আরব্ধ আরব্ধের পুত্র গান্ধার। গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত। ধৃত হইতে দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদ হইতে প্রচেতা প্রচেতার একশত পুত্র ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া উত্তরদিক আশ্রয় করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

"দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ ততঃসেতুঃ সেতু পুত্র আরব্ধান্নাম। তদাত্মজো গান্ধার স্ততঃ ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাৎ ধৃতঃ ধৃতাৎ দুর্গমস্ততঃ প্রচেতাঃ

প্রাচেতসং পুত্রশতং অধর্ম্ম বহুলানাং ম্লেচ্ছাদিনাং মুদীচ্যাদিনা মাধিপত্য মকরোৎ।

অর্থাৎ দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধান আরব্ধানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত, ধৃত হইতে দুর্গম, দুর্গম হইতে প্রচেতা, প্রচেতার একশত পুত্র হইয়াছিল তাহারা সকলেই উদীচ্য প্রভৃতি দেশজাত অধর্ম্ম নিরত ম্লেচ্ছজাতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের প্রামাণিক ও প্রাচীন টীকাকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীধর স্বামী উক্ত সপ্তদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন।

"ম্লেচ্ছাধিপত্য কথনাৎ যযাতি শাপ পরিণামো
ম্লেচ্ছভাবঃ স্বচিতঃ।

অর্থাৎ ম্লেচ্ছাধিপত্যের দ্বারা যযাতি শাপে প্রাচেতারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্তই পুরাণে আর প্রচেতার সন্তানগণ স্থান প্রাপ্ত হন নাই।

ঢাকাপ্রকাশ যে রাজ রত্নাকরের মত অবলম্বন করিয়া ত্রিপুরা পতির এক বংশাবলী মুদিত করিয়াছেন তাহাতে ও দ্রুহ্যু হইতে প্রচেতা পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করতঃ ক্রমান্বয়ে বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতির নাম লিখিয়াছেন।

এইক্ষণ পাঠকগণ দেখুন যদি সত্য সত্যই দ্রুহ্য ও তাহার অধস্তন প্রচেতা প্রভৃতি সন্তানগণ ত্রিপুরাতে রাজ্য করিয়া থাকেন, তবে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের মতে ত্রিপুরা দেশ ম্লেচ্ছ দেশ ও ত্রিপুরা জাতি ম্লেচ্ছজাতি তাহার কোন সন্দেহই নাই। এবং সংসর্গনিবন্ধন ত্রিপুরাধিপের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচেতা হইতেই তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি ত্রিপুরার রাজবংশ দ্রুহ্যুর সন্তান নন। কারণ দ্রুহ্যু কখনও পূর্ব্বদেশে আইসেন নাই এক্ষণ আপত্যকারীগণের মতে দ্রুহ্যুর সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলেও ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরা জাতি ম্লেচ্ছজাতি, ত্রিপুরা দেশ ম্লেচ্ছ দেশ। আমাদের পূর্ব্ব কথিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের মতেও ঐ জাতি আর্য্যজাতি নহে। ত্রিপুরা জাতি কিরাত জাতি, এবং ত্রিপুরা রাজ্য কিরাত রাজ্য। কোনও জাতি আপনাদিগকে চন্দ্র বা সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিলেই যে তিনি হিন্দু হইবেন এবং হিন্দুগণ ঐরূপ জাতির সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারেন এমন নয়। কারণ হিন্দুধর্ম্ম আচারমূলক। আচারদোষে হিন্দুধর্ম্মের জাতি লোপ হয়।

ইজিপ্ট দেশীয়েরা কহে তাহারা সূর্য্যবংশীয় এবং তাতারেরা কহে তাহারা চন্দ্রবংশীয় এবং চীনেরা কহে তাহারা চন্দ্রবংশীয় যযাতির পিতামহ আয়ুর সন্তান। পুরাণ ও মনুসংহিতানুসারে ও যবন খশ কিরাত চীন প্রভৃতি জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাই বলিয়াই কি পণ্ডিতগণ ইজিপ্ট, তাতার ও চীনাদের জল পান করিতে পারেন।

ঢাকাপ্রকাশ অতি গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছেন যে "যে সকল পণ্ডিতের মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ত কণ্ঠস্থ ছিল। শাস্ত্রানুযায়ী পাপ পুণ্যের প্রতি যাহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, শাস্ত্রের অনুশাসন অতিক্রম করিয়া যাঁহারা কোন ও কার্য্যানুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতিকে অক্ষত্রিয় রাজা জানিয়া তদ্দত্ত দান প্রতিগ্রহণ দ্বারা ঘোরতর মহাপাতকভাগী হইতে গিয়াছিলেন। এমন, বর্ব্বর কে যে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে?"

কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে যে পণ্ডিতেরা ত্রিপুরা পতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে যে তাঁহারা ত্রিপুরা জাতি স্পৃষ্ট জল পান করিয়াছেন এবং কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে যে দ্রুহ্যুর বংশধরগণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় নাই এবং কোন মুনির মতে যে দ্রুহ্যু বা তৎপুত্র পূর্ব্বদেশে আগমন করেন এবং কোন পুরাণের মতে যে সত্য ত্রেতা বা দ্বাপর যুগে অথবা কলির প্রারম্ভেও রাঙ্গামাটীয়ার নাম উদয়পুর ছিল এবং কোন গ্রন্থের বলে যে রত্নফারর পূর্ব্বেও ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মাণিক্য উপাধি ছিল এপর্য্যন্তত কোন পণ্ডিত এমন কোন শাস্ত্রোক্ত বিধানের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। যদি শাস্ত্রেই ইহার বিধান থাকিবে তবে পণ্ডিতেরা নীরব রহিয়াছেন কেন, এত নূতন কথা ও নূতন পুস্তকের নাম শুনিতেছি কেন? শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি প্রামাণিক, গ্রন্থগুলি কি হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত

নয় ? না, কাকিনীয়ার মহা কথা ও রাজরত্নাকর ধর্ম্মশাস্ত্র ? প্রতিবাদকারী ভট্টাচার্য্যের মতে দ্রুহ্যুপুত্র উগ্রপ্রতাপ এই বংশের আদিপুরুষ ও ত্রিপুরা রাজ্যের স্থাপয়িতা। রাজমালার মতে দ্রুহ্যু পুত্র ত্রিপুর এবং ঢাকাপ্রকাশের মতে দ্রুহ্যুপুত্র বভ্রু ঐ বংশের আদিপুরুষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম রাজা।

রাজমালার মতে দ্রুহ্যুর পৌত্র ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঢাকাপ্রকাশের মতে দ্রুহ্যু হইতে অনেক পুরুষের পরে, চিত্ররথের রাজত্ব সময়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল।

যাহা হউক স্বয়ং ত্রিপুরাধিপতি এই সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি কোন বংশোদ্ভব এবং কে তাহার পূর্ব্বপুরুষ তাহা আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই নাই। কিন্তু ত্রিপুরেশ নন্দন নবদ্বীপচন্দ্রের অনুগৃহীত সিংহ মহাশয় যে ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রবংশের নহুষ তনয় যযাতি নন, অন্য কোন যযাতি হইবেন এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

ফলতঃ ঢাকাপ্রকাশ ব্যস্ততা ও মত্ততা বশতঃ কলমে যাহা উঠিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন তাঁহার যদি পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অথবা আধুনিক ইতিহাসাদি গ্রন্থেও কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি থাকিত অথবা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও সম্পাদকের পদোচিত গৌরব ও নিরপেক্ষপাতিতা তাঁহার মনে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনও এইরূপ অসার ও অকর্ম্মণ্য এবং অলিকযুক্তি পরম্পরা পত্রস্থ করিতেন না এবং দম্ভভরে গুরুস্থানীয় হিন্দুসমাজ সকলের প্রতি নিতান্ত অশিষ্টের ন্যায় অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতেন না।

যাহা হউক ঢাকাপ্রকাশের যুক্তির অলিকতা ও অসারতা স্ব-

তঃই উপলব্ধি হয় বিবেচনা করিয়া আমরা উহার সমালোচনা করিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু পরিশেষে ভাবিলাম তিনি যেরূপ লজ্জাশীল ও শিষ্টপ্রকৃতির লোক এহার উত্তর না দিলে তিনিও তৎসদৃশ বিবেচকেরা মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করিতে থাকিবে যে ঢাকাপ্রকাশে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তর নাই। আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল ঐ বিবেচনায়ই ঢাকাপ্রকাশের সমালোচনা করিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রকরণ।

কালীপ্রসন্ন বাবু, যুক্তি ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এবং আমাদের প্রতি গালিবর্ষণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ঢাকাপ্রকাশের কনিষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমরাও ঢাকাপ্রকাশের পরেই তাঁহার যুক্তি ও উক্তির সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু ত্রিপুরা পক্ষসমর্থনার্থ লিখিয়াছেন যে "কামাখ্যা তন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, যে, দ্রুহ্যুর সন্তানগণ পূর্ব্বপ্রদেশে "উদয়পুর নামক স্থানে" বাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহাভাগ যযাতি তৎপুত্র দ্রুহ্যুকে পশ্চিম দেশে রাজ্য প্রদান করিয়া থাকিলেও তাঁহার বংশধরগণ যে পূর্ব্বদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে না, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে। পশ্চিমদেশবাসিগণ পক্ষে পূর্ব্বদিকে রাজ্য সংস্থাপন অসম্ভব হইলে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজগণ কখনও সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করিতে পারিতেন না।"

কালীপ্রসন্ন বাবু ঢাকাপ্রকাশের ন্যায় দুহ্মা হস্তিনা হইতে

নির্ব্বাসিত হইয়া, পূর্ব্বদেশে রাজ্যস্থাপন করেন, এরূপ বলেন না। তাঁহার মতে দ্রুহ্যুর পশ্চিমদিকে রাজ্য প্রাপ্তি একরূপ স্বীকৃত। তবে শেষ দ্রুহ্যুর সন্তানগণ পূর্ব্বদেশে আসিয়া প্রথম উদয়পুরে রাজ্য স্থাপন করেন এবং ঐ উদয়পুর ত্রিপুর রাজবংশের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী এবং ঐ উদয়পুরের স্থাপয়িতাকে দ্রুহ্যুর সন্তান বলিয়া বলেন।

দ্রুহ্যুর কতপর। পরে কোন পুরুষের সন্তান কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উদয়পুর অধিকৃত হয়, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রতিবাদপত্রে তাহা উল্লেখ করেন নাই। কালীপ্রসন্ন বাবু কামাখ্যাতন্ত্র না দেখিয়া পণ্ডিতগণের মুখে ঐ গ্রন্থের নাম শুনিয়াই, ঐ গ্রন্থের বলে প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই পুত্র পৌত্রাদি শব্দও উদয়পুরের স্থাপয়িতার নাম নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল দ্রুহ্যুর সন্তানগণ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং নিজের উন্নত বুদ্ধিবলে ইংরেজদের ভারতবর্ষে রাজত্ব দেখিয়া, দ্রুহ্যুর সন্তানগণও ত্রিপুরাতে রাজত্বকরা সম্ভব বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন।

কামাখ্যা তন্ত্রে দ্রুহ্যুর বিবরণ আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা যে প্রবাদ তুলিতেছেন এবং কামাখ্যা তন্ত্রের নামে সম্প্রতি যে সকল বচন বাহির করিয়াছেন তাহা যে স্থলে কি পদার্থ, এবং যে সময় হইতে উদয়পুর আখ্যার সৃষ্টি, ও যে সময় হইতে উদয়পুর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হয়, আমরা ভট্টাচার্য্য প্রকরণে তাহা সবিশেষে দেখাইয়াছি এবং দ্রুহ্যু বা তৎসন্তানগণ যে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন নাই ও দ্রুহ্যুর সন্তানগণ যে ম্লেচ্ছ ছিলেন, এবং তাঁহারা ম্লেচ্ছ রাজ্যের অধিপতি মাত্র ছিলেন! তাঁহারা কোন হিন্দুরাজ্যের অধিপতি ছিলেন না ও কোন সন্তানই হিন্দু ছিল না আমরা টীকাপ্রকাশ প্রকরণে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিধান পরম্পরা দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছি। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে তাহা

আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। কালীপ্রসন্ন বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ প্রকরণ ২টী পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

তৎপর তাঁহার ঐ সম্বন্ধে এক যুক্তি এই। যখন সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছে, তখন ত্রিপুরাতে দ্রুহ্যুর সন্তানগণ রাজত্ব করিবে ইহা অসম্ভব কি।

আমরা এই যুক্তির যে কোন সার আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইংরেজ ও দ্রুহ্যুর সন্তানের সহিত, পশ্চিম ভারতবর্ষ ও আগড়তলার ঐরূপ কোনও সম্পর্ক বিধাতার পরিকল্পিত কি। যাহা হউক প্রমাণ থাকিলে যে অনুমান কোন কার্য্যের নহে, একথা বোধ হয় শাস্ত্রে দৃষ্টি না থাকিলেও যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বোধ ও বিচার শক্তি আছে তিনিও স্বীকার করিবেন। অতএব যখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, দ্রুহ্যুর সন্তানগণ পূর্ব্বদেশে আগমন করেন নাই। তাঁহারা প্রথমে পশ্চিমে ও পরে উত্তরদিগস্থ দেশে বাস করিয়াছিলেন তখন যে জাতিকে আবহমান কাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার করিতে এবং ক্ষত্রিয়ের সহিত আদানপ্রদান করিতে দেখিতেছি না। তখন পূর্ব্বদেশ বাসী সেই জাতিকে ক্ষত্রিয় বিশেষতঃ পশ্চিমদেশ বাসী দ্রুহ্যুর সন্তান বলিয়া কি রূপে স্বীকার করিব। ফলতঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর এই যুক্তি যে নিতান্ত অসার অশ্রদ্ধেয় ও হাস্যজনক, ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের বিরোধী ও নিতান্ত অলিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখনী ত্রিপুরা রাজবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশে উপরি উক্ত শাস্ত্রের নাম এবং যুক্তি প্রসব করিয়াই বিরামলাভ করিয়াছে। তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কিছুই না লিখিয়া, ঢাকাস্থ হিন্দুসভার প্রতি নিতান্ত অন্যায় ও

অলিকরূপে কতকগুলি কল্পিত দোষ আরোপ এবং পূর্ব্ব প্রচারিত পত্রের কয়েকটী বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার প্রধান প্রধান আপত্য এই।

প্রথম পত্রে বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ১৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল যে দ্রুহ্যুর সন্তানগণ ম্লেচ্ছ হইয়াছিলেন। এবং উহার পোষকতার্থ বিষ্ণুপুরাণের প্রামাণিক ও প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ অধ্যায়ের যে টীকা করিয়াছেন। সেই টীকার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

" ম্লেচ্ছাধিপত্য কথনাৎ যযাতি শাপ পরিণামো ম্লেচ্ছভাবঃ সূচিতঃ "।

কালীপ্রসন্ন বাবু ইহাতে এই আপত্তি করেন যে " মহামতি যযাতি, দ্রুহ্যুর প্রতি ম্লেচ্ছাধিপত্য সম্বন্ধে কোন অভিশাপ প্রদান করেন নাই। কেবল ২য় পুত্র তুর্ব্বসুর প্রতি ঐ রূপ অভিশাপ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীধর স্বামীর ঐ টীকা দ্রুহ্যু অথবা তাহার সন্তানগণের প্রতি প্রযুক্ত নহে "।

কালীপ্রসন্ন বাবুর যদি বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই ঐ রূপ আপত্য করিতেন না। বিষ্ণুপুরাণের এক২ অধ্যায়ে এক২ ব্যক্তির বংশ লিখিত হইয়াছে এবং টীকা কার ও অধ্যায়ের২ স্বতন্ত্র২ ভাগে টীকা করিয়াছেন। উদ্ধৃত টীকাংশ সপ্তদশ অধ্যায়ের টীকা। সুতরাং ঐ ব্যাখ্যা দ্রুহ্যুর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল তুর্ব্বসু সম্বন্ধে নহে। কালীপ্রসন্ন বাবু অনুমান করিয়াছেন মহামতি যযাতি, দ্রুহ্যু বা তৎসন্তানের প্রতি ম্লেচ্ছাধিপত্যসম্বন্ধে কোন শাপ দেন নাই সুতরাং "যযাতি শাপপরিণামঃ" এই বাক্য দ্রুহ্যু বা তৎসন্তানের প্রতি প্রযুক্ত নহে, তুর্ব্বসু সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তাঁহার এই লিখনভঙ্গী দ্বারা তিনি যে কস্মিনও মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করেন নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

দ্রুহ্য সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইয়াও সিংহাসন লাভ করিতে পারিলেন না, তিনি যযাতি শাপে রাজ্যের উত্তমস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পিতার আজ্ঞায় পশ্চিমদিগস্থ দেশবিশেষের অধীন শাসন কর্ত্তা হইলেন। তৎগতিকে তাঁহার সন্তানগণ ও আর হস্তিনায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া ক্রমে অধীনস্থ অধর্ম্ম নিরত জাতিসহ সংসর্গ নিবন্ধন আচার ভ্রষ্ট ও ম্লেচ্ছ হইয়া গেলেন। যযাতি শাপ প্রদান না করিলে দ্রুহ্যর পশ্চিম দেশে প্রাপ্তি হইত না এবং ক্রমে সংসর্গ দোষে দ্রুহ্যর সন্তানেরা ও ম্লেচ্ছ হইত না। এই নিমিত্তই টীকাকার লিখিয়াছেন—দ্রুহ্য সন্তানের ম্লেচ্ছত্ব যযাতি শাপেরই পরিণাম। অর্থাৎ ম্লেচ্ছাধিপত্য সম্বন্ধে অভিসম্পাত না হইলেও ঐ অভিসম্পাতই দ্রুহ্যসন্তানের ম্লেচ্ছাধিপত্যের কারণ। এবং ম্লেচ্ছদেশের আধিপত্যই দ্রুহ্যসন্তানের ম্লেচ্ছত্বের হেতু ঐ শাপ ভিন্ন দ্রুহ্যসন্তানের ম্লেচ্ছাধিপতি হওয়ার কারণ ছিল না এই কারণ টীকাকার লিখিয়াছেন "যযাতি শাপ পরিণামো ম্লেচ্ছভাবঃ সূচিতঃ। ঐ ব্যাখ্যা তুর্ব্বসুর প্রতি প্রযুক্ত নহে। এবং তুর্ব্বসুর সন্তান প্রতি ঐ ব্যাখ্যা প্রযোগ হইতেও পারে না। কারণ তুর্ব্বসু বা তাহার সন্তান কেহই ম্লেচ্ছ হন নাই। কিম্বা যযাতি তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া কোন শাপ প্রদান করেন নাই সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং স্বমত সমর্থনার্থ কল্পনা কল্পিত ও মিথ্যা, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাজে সমাজে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে "মহা প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামীগণ ও সম্মানিত সর্ব্ব বিদ্যার সন্তানগণ এই পবিত্র রাজ বংশের ও তদীয় আত্মীয় গণের কুল গুরু"।

ঐ সম্বন্ধে প্রথম পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে। মহা প্রভুর

সন্তান ছিল না। সন্তান জন্মনের পূর্ব্বেই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু উহার উত্তরে লিখিয়াছে " মহা প্রভু এস্থলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিশেষণ শব্দ, যদি তাহা না হইয়া পৃথক ব্যক্তি জ্ঞাপক হইত। তাহা হইলে, মহা প্রভু শব্দের পর ছেদ চিহ্ন " (,) কমা, অথবা ও কি এবং " কোন যৌগিক শব্দ ব্যবহৃত হইত " কেবল সূক্ষ্মদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিবাদ কারিগণের একটী বিশেষণ পদ বুঝিবার ভ্রম মাত্র।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক মহা প্রভু শব্দ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিশেষণ কিনা। মহা প্রভু শব্দ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিশেষণ হইতে পাবে কিনা। এবং মহা প্রভু শব্দ চৈতন্য দেব বোধক ভিন্ন কখনও অন্যের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইযাছে কিনা।

কোন দেশে কোন কালে কোন ব্যক্তিই মহা প্রভু শব্দ কোন দেবতা বা দেবাবতার কি মহদ্ব্যক্তির বিশেষণ রূপে ব্যবহার করেন নাই। পুরুষোত্তম বলিলে যেরূপ বিষ্ণুকে বুঝায়, মহেশ্বর বলিলে যেরূপ মহাদেব কে বুঝায, ঐ দুই দেবতার দুই বিশেষণ যেমন অপর গামী নহে। তদ্রূপ মহা প্রভু বলিলে চৈতন্য দেব কে বুঝায়, চৈতন্যের ঐ বিশেষণ ও অপর গামী নহে।

অদ্বৈত বা নিত্যানন্দ কখন ও মহা প্রভু পদ বাচ্য নহেন এবং ঘোর অশিক্ষিত লোকেরা ও অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে কখনও মহা প্রভু বলে না তাঁহাদিগকে প্রভু মাত্র বলিয়া থাকে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহামন্য ধর্ম্মগ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃতের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,

" ইথেভক্ত ভাবিয়ে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্ত স্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই॥

ভক্ত অবতার তার আচার্য্য গোসাই।
এই তিন ভক্ত সবে প্রভু করি গাই॥
এক মহা প্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহা প্রভুর চরণ॥"

এক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন,মহা প্রভু শব্দে চৈতন্যের ব্যাখ্যা করা আমাদের অসঙ্গত হইয়াছে কি না। আপত্য কারিগণ লোকের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া স্বমত সমর্থনার্থ মহা প্রভুর বংশধর রাজবংশের কুলগুরু উল্লেখ করিয়াছিলেন শেষ ধরাপড়াতে এক্ষণ নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় মহা প্রভু শব্দটীকে বিশেষণ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন। যেরূপ অপেয় পানদ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হয় তদ্রূপ রীতিবিরুদ্ধ ভাষা ব্যবহারে ভাষারও পবিত্রতা নষ্ট হয়। যদি কালীপ্রসন্ন বাবুর ঐ সকল ভয় থাকিত, তবে তিনি এরূপ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।

কালীপ্রসন্ন বাবু ঐ সকল যুক্তির বলে আপনাকে নিতান্ত দুর্জ্জয় ও গৌরবান্বিত মনে করিয়া আমাদেরপ্রতি যথেচ্ছ নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং তাহার প্রচারিত পত্রে, আমাদের অপেক্ষা অনেক বহুদর্শী ভাষাজ্ঞ বিজ্ঞ লোক আছেন বলিয়া আমাদের প্রচারিত মতের প্রতি লোকের তাচ্ছল্য জন্মানের চেষ্টা করিয়াছেন। এবং ঐ উদ্দেশ্যে অনেক অমূলক কথা লিখিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। আমাদের অপেক্ষা যে বহুতর বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিদ্বান লোক বর্ত্তমান আছেন। আমরা শতবার একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত কোন একজনও যথার্থ বিজ্ঞ বহুদর্শী ও বিদ্বান ব্যক্তি ত্রিপুরা জাতিপৃষ্ট জলপানকারীগণের ঐ আচরণের বৈধতা বা ত্রিপুরাজাতিকে হিন্দু জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে না। প্রত্যুত সকলেই পণ্ডিতগণের

জলপান করা নিতান্ত গর্হিত এবং ত্রিপুরাজাতিকে হিন্দুধর্ম্ম বহিষ্কৃত জাতিবিশেষ মনে করিতেছেন।

অনেকে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্ম প্রধান বিক্রমপুর কালীপ্রসন্ন বাবুর জন্মস্থান। এবং তিনি নিজেও সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, এরূপ অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি এরূপ কুপথগামিনী হইল কেন? আমরা ইহার কিছুই উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। পরিশেষে যখন রাষ্ট্র হইল যে কালীপ্রসন্ন বাবুর পিতা দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছয়গাও নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় ত্রিপুরায় যাইয়া ত্রিপুরাজাতিস্পৃষ্ট জলে উদর পবিত্র করিয়াছেন। তখন হইতে আর লোকে আমাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করে নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত প্রকরণ—

আমরা ইতিপূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য প্রকরণে বারবার বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রচারিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়াছি। সিংহ মহাশয় তাঁহার সেই ইতিবৃত্তের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে,—

"যে সময়ে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইতে ছিলেন, তখন বঙ্গদেশের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত, ব্রহ্মরাজ্যের পশ্চিম, আরাকান রাজ্যের উত্তর, এবং মণিপুর হেরম্ব ও শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতময় ভূমি কিরাতরাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল।" "ত্রিপুর পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ এবং কিরাত নামের উচ্ছেদ করিয়া স্বীয় নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা এবং প্রজাগণকে ত্রিপুরাজাতি বলিয়া প্রচার করিলেন।"

তিনি ঐ গ্রন্থে ত্রিপুরা জাতির বিবরণ খণ্ডে লিখিয়াছেন "বোধ হয় ত্রিপুরাগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসী"। সুতরাং সিংহ মহাশয়ের মতে ত্রিপুরাজাতি কিরাত জাতির নামান্তর মাত্র। অতএব এক্ষণ ইহাই মীমাংসা করা আবশ্যক যে ত্রিপুরা অর্থাৎ কিরাত জাতি, আর্য্যজাতির অন্তর্গত আচরণীয় হিন্দু জাতি কি না?।

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শনকৈশ্চক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়ঃ জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে নচ ॥
পৌণ্ড্রকা শ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনা শকাঃ।
পারদঃ পহ্লবাশ্চীনা কিরাতা দাবরঃ খশাঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাব বশতঃ ক্রিয়াহীন হইয়া পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দাবর ও খশ ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরশুরাম পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে——

"চর্ম্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা।
পুলিন্দো মেধভল্লশ্চ ঝল্লোমল্লশ্চ খারকাঃ ॥
কুন্দকারঃ কাণ্ডকারঃ ডোখলো মৃতপস্তথা।
কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খশো দ্রবিড় এবচ।
চণ্ডালো হড্ডিপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ চর্ম্মকার (চামার) কুরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ডোখল, মৃতপ (মুর্দ্দফরাশ) কিরাত, নিষাদ, খশ, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হড্ডিপ (হাড়ি) এই কয়েক জাতি অন্ত্যজাত অর্থাৎ শেষজাতি জাতিসমূহের মধ্যে নিতান্ত অধম অর্থাৎ অস্পর্শনীয়।

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বচনদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে,

চণ্ডাল, চর্ম্মকার আদি জাতির ন্যায় কিরাত অর্থাৎ ত্রিপুরা জাতি হিন্দুজাতির অস্পর্শনীয়। এক্ষণ আগড়তলার জলপানকারী পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কিরাত জাতির সমশ্রেণীস্থ চর্ম্মকার আদির জল চল না করা তাঁহাদের পক্ষে পক্ষপাতের কার্য্য বলিয়া অন্যেরা মনে করিতে পারে কি না।

কথিত ইতিবৃত্তের রাজবংশের বিবরণমধ্যে লিখিত আছে "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।" "আমাদের বিবেচনায় ত্রিপুরার রাজবংশের বিবাহপ্রণালী সকল নিশ্চয়রূপে লোকসমাজে প্রকাশ করা যায় না। কারণ কোন হিন্দুপরিবারে বর্ত্তমান সময়ে এবম্প্রকার কুপ্রথা আমরা দেখিতেছি না।" "ত্রিপুরার রাজবংশে বাল্যবিবাহ অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ বিবাহই প্রাপ্তবয়স্ক বয়সের মধ্যে সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রকারেরা রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল নরকগামী হইবে বলিয়া বঙ্গবাসীদিগকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, ত্রিপুরার রাজবংশজগণ তাহাতে বিহ্বল হন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশ বিবাহই রজোদর্শনের পরে হইয়া থাকে। রাজবংশে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহও কখন কখন হইয়া থাকে।"

আমরা এক্ষণ ত্রিপুরা জাতি স্পৃষ্টজলপানকারী পণ্ডিত ও তাঁহাদের পক্ষসমর্থনকারী মহাত্মাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে জাতি প্রাতিলোম্যে জাত, সে জাতি কি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি।

ঐ ইতিবৃত্তে জাতিবিবরণখণ্ডে লিখিত আছে;—"ইহারা দেব দেবীর নিকট ছাগ, ছাগী, কুক্কুট, হংস, ডিম্ব, বরাহ, মহিষ, গবয় প্রভৃতি বলিদান করিয়া থাকে।" "ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।"

উল্লিখিত ইতিবৃত্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "দান কুরুফা রাজ্যাধিকারী হইলেন। তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি পুত্রগণের বুদ্ধি পরীক্ষা করতঃ ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী স্থির করিবার জন্য যুদ্ধের কুক্কুট সকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে ভৃত্যদিগকে অনুমতি করেন। পরে যখন তিনি পুত্রগণের সহিত একত্র আহার করিতে বসিলেন, তখন একজন অনুচরকে, ঐ সকল কুক্কুট আহারের স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য গোপনে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ৩০টী কুক্কুট ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তখন তাহারা সমস্ত দিন নিরাহারের পর ভোজ্য দর্শনে রাজকীয় পাত্রের দিগে ধাবিত হইল। মহারাজ কুক্কুটসকল যাহাতে পাত্রস্পর্শ করিতে না পারে, তদুপায় করিবার জন্য কুমারগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু কুমারেরা সমস্ত কুক্কুট একবারে নিবারণের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার রত্নফা সহসা পাত্র হইতে কথক গুলি অন্ন লইয়া কুক্কুটগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। নৃপতি তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব দর্শনে তাহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।"

এক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে জাতি মধ্যে বিবাহ বিষয়ে জাতি ভেদ নাই, যাহারা কুক্কুট, ডিম্ব, বরাহ ও ছাগ প্রভৃতি বলিদান করে। ভোজন গৃহে কুক্কুট প্রবেশ করিলেও তাহাদের অন্ন দূষিত হয় না। সেই জাতির আচরণ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সদাচরণ কিনা। এবং ঐ রূপ জাতির জল হিন্দুজাতির ব্যবহার্য্য কিনা।

রাজবংশের ঐ সকল আচরণ আমাদের স্বকপোল কল্পিত নহে। ভূত পূর্ব্ব ত্রিপুরেশ নন্দন নবদ্বীপচন্দ্র যিনি আপন কুল গৌরব বৃদ্ধিজন্য সিংহ মহাশয়ের দ্বারা ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়া-

ছেন। আমরা সেই ইতিবৃত্ত হইতেই এই সকল বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। সুতরাং ঐ সকল কথা রাজবংশধর গণের স্বীকৃত কথা, তাহার সন্দেহ নাই।

অপরঞ্চ অন্যান্য হিন্দু সমাজের সহিত আবহমান কাল হইতে ত্রিপুরা জাতির আচার ব্যবহার আদি বিষয়ের প্রার্থক্য প্রমাণার্থ, ত্রিপুরার ভুত পূর্ব্ব মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর বাদী, বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিবাদীর নামে ত্রিপুরা জজ আদালতে ১৮৭৪ইং ৩৫নং রাজত্বের দাবিতে যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে যে সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়াছিল। ত্রিপুরা হিন্দু সমাজ সংরক্ষিণী সভা হইতে মুদ্রিত সাময়িক সমালোচনা নামক পত্রিকা হইতে তাহার পাঁচটী জবানবন্দির নকল আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম সেই জবানবন্দি এই।

" মহারাজ বিবাদীর ২৫নং সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পুর্ব্বক কহিল আমার নাম কাশীনাথ দেব শর্ম্মণ পিং নাম দয়ারাম চক্রবর্ত্তী সাং বাঘউরা পং নুরনগর বয়স্ ৫৬। ৫৭ ব্যবসা যাজনিক ও তালুকদারী। পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজাগণের স্পৃষ্ট জল আমি কখন ও পান করি নাই। কারণ তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল পুর্ব্বে কেহ কখন পান করিয়াছে আমি শুনি নাই। শূদ্র বৈদ্যের স্পৃষ্ট জল আমি পান করি। ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট জল ও পান করি। আমি তন্ত্র শাস্ত্রের পণ্ডিত।"

মহারাজ বিবাদীর ৯নং সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল আমার নাম শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত পিং নাম মৃত লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত সাং মোহনপুর পং সরাইল বয়স ৪৫। ৪৬ মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় আমি চাকলার কাচারির মোহরের ছিলাম। তৎপর

রাজধানীর পেস্কারী কার্য্যে নিযুক্ত হই। আমার উল্লেখিত * ত্রিপুরার রাজবংশীয় ঠাকুর গণের স্পৃষ্ট জল আমি কখনও পান করি না। ঐ ঠাকুর লোকের স্পৃষ্ট জল কোন ব্রাহ্মণ কি শূদ্র পান করে না। আমার কথিত রাম মাণিক্য দেওয়ান ঐ রূপ স্পৃষ্ট জল পান করে না। তাহারা টিপরা এই কারণে তাহাদের স্পৃষ্ট জল পান করে না। রাজা এবং তৎপরিবারস্থ লোক ঐ ঠাকুর দের সঙ্গে আহার করে। পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তি গণ টিপরা। তাহাদের স্পৃষ্ট জল আমরা পান করি না। পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজ পরিবারস্থ কেহ আমার পাকের ঘরে প্রবেশ করিলে আমি সমুদায় খাদ্য দ্রব্য ফেলাইয়া দিব। এবং ঐ ভাণ্ডের খাদ্য দ্রব্য আমি কখনই খাইবে না। রাম মাণিক্য দেওয়ান ও ঐরূপ খাদ্য দ্রব্য খাইবেনা। রাম মাণিক্য দেওান ক্ষত্রিয় আমি বৈদ্য।

বাদীর মাণিত ৮নং সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল আমার নাম শ্রীরামমণি ভট্টাচার্য্য পিং নাম মৃত গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য সাং কোটালি পাড়া জিলা ফরিদপুর বয়স ৬২ বৎসর পেশা পৌরহিত্য। আমি ত্রিপুরার রাজবাড়ীর পুরোহিত ছিলাম। কোন কায়স্থ কি শূদ্রের স্পৃষ্ট জলপান করিতে আমার আপত্য নাই। পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট জল আমি পান করি না। ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট জল আমি পান করিতে পারি। পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজপরিবার শূদ্র হইতেও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আগড়তলা দেবালয় আছে রাজা ভিন্ন তৎপরিবার কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। রাজা বিষ্ণু অংশ। তাঁহার পরিবার নীচ জাতীয় সুতরাং দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। রাজবাড়ীর

---

* ঠাকুর সাহেব রাজার প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। এপ্রকার কবরা প্রভৃতি উপাধি আছে।

পাচকগণ রাজার একবংশ তাহা দিগকে টিপরা বলে। আমি শুনিয়াছি তাহারা রাজ বাটীর বাহিরে শূকর কুক্কুট খায়। কিন্তু রাজ বাড়ীতে তাহা পারে না। রাজ বাটীর বাহিরে টিপরারা শূকর কুক্কুট রাখে তাহা আমি জানি। আমি তাহাদের বাটীতে দেখিয়াছি। আমার ভাতিজা নিমানন্দ এক্ষণ রাজ বাড়ী পুরোহিত আছে। আমি রাজবংশ ঠাকুর লোকের বাড়ী কার্য্য কর্ম্ম করি না। আমি পুরাণে এক সুবিখ্যাত রাজার নাম শুনিয়াছি। তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত আছেন। কিন্তু তিনি ত্রিপুরার রাজার পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া আমি জানি না ও শুনি নাই। এবিষয় আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমার ভাতিজা নিমানন্দের নিকট শুনিয়াছি ত্রিপুরার রাজপরিবার পূর্ব্বে কাস্যপ গোত্রছিল। এক্ষণ বৈযাঘ্র পদ্ম গোত্র হইয়াছে রাজার কুল পুরোহিত গণ যাহারা পাত্রান্ন গ্রহণ করে, তাহারা উদয়পুরে বাস করিতেছে। তাহারা পতিত।"

বাদীর ৪নং সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিল আমার নাম শ্রীরাম দুলাল বিদ্যাভুষণ। পিতা মৃত রামরাম চক্রবর্ত্তী সাং নোয়াদৈল পং নুরনগর। আমি মহারাজার দ্বার পণ্ডিত। আমি ১২৭৫ ত্রিংসনে (১২৬৮ বাং) দ্বার পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছি। ত্রিপুরার স্পৃষ্ট জল আমি পান করিতে পারি না। রাজা টিপরা বংশ। (এই সাক্ষী ত্রিপুরা জিলার একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত)।"

৬ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের প্রপৌত্র ও ত্রিপুরার রাজবংশের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঠাকুর স্ববংশের গৌরব রক্ষার্থ ক্ষত্রিয় থাকা উল্লেখ করিয়া ও জবানবন্দীতে যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা ও ত্রিপুরা জাতি অচল থাকা অকাট্য রূপে সাব্যস্ত হইতেছে।

বাদীর মানিত ১১নং সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল। আমার

নাম শ্রীঈশানচন্দ্র ঠাকুর পিং নাম মৃত শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর বয়স ৪৭। ৪৮ বৎসর। আমি রাজপরিবারের ব্যক্তি ও রাজ সরকার হইতে ভরণ পোষণের বৃত্তি পাইয়া থাকি। আমি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের বংশোদ্ভব। আমাদের রাজপরিবার রাজ পুতনা কি বঙ্গদেশীয় কোন ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহে আদান প্রদান করিতে পারে না। কারণ টিপরাদের সহিত আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। বঙ্গদেশীয় কি রাজ পুতনার ক্ষত্রিয়দের নিকট আমাদের রাজবংশে কন্যা বিবাহ দিলে তাহাদের জাতি ধ্বংশ হয়। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় হইতে আমরা পৈতা ধারণ করিতেছি। সন্তান জন্মিবার পর ও রাজ পরিবারে ঐ সন্তানের মাতাকে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত আমি জ্ঞাত আছি।

* * মহারাজার মাতার সন্তান জন্মিবার পর শাস্ত্রিগৃহীতা প্রণালীতে বিবাহ হয়। তৎপূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল না। * * মহারাজার মাতার ও সন্তান জন্মের পর বিবাহের কথা শুনিয়াছি। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরা রাজ পরিবার বৈযাঘ্র পদ্ম গোত্রের কথা শুনিতেছি। বৈযাঘ্রপদ্ম গোত্র হইতে ত্রিপুরা রাজ পরিবার উদ্ভব হয় নাই। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় হইতে রাজারা বৈযাঘ্র পদ্ম গোত্র বলে। কিন্তু আমরা তাহা বলি না। আমরা টিপরাদের সহিত আহার করি এজন্য রাজপুতনার ক্ষত্রিয়দের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ হয় না। টিপরাদের সহিত আহার করাতে আমরা নিকৃষ্ট হইয়াছি। পার্ব্বতীয় লোকের সহিত আমাদের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হয়।

আমি পূর্ব্বপুরুষের নিকট শুনিয়াছি আমরা কাশ্যপগোত্র ছিলাম। দেব দেবীর পূজার সময় গোত্র উল্লেখ হয়। প্রবর

---

* * নাম স ধারণে প্রকাশ করা অরুচিকর বিবেচনায় লেখা হয় নাই।

উল্লেখ হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা একমাস অশৌচ গ্রহণ করিত। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় হইতে ১৩ দিন অশৌচ হইয়াছে। আমি এক মাস অশৌচ পালন করি। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মাতার মৃত্যুর সময় ১৩ দিন প্রচলন হইয়াছে। দীর্ঘকাল গত হইল আমরা টিপরা হইয়াছি। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বহু পূর্ব্বেই টিপরা হইয়াছি। টিপরাদের সহিত কেবল আহার করি এমন নয় টিপরাদের কন্যাও বিবাহ করি।"

এই সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়াও যদি কেহ বলেন যে টিপরা জাতির স্পৃষ্টজল পান করাতে পণ্ডিতেরা দোষী নন্। তবে কোন জাতির জল যে অব্যবহার্য্য তাহা তাহারাই জানেন।

সমাপ্ত।